গল্প বলা গল্প লেখা ন্যারেটীর ভূমিকা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ন্যারেটলজি নামে যে নতুন শাস্ত্রটি তৈরি হয়েছে, তার অনেক ব্যাপারেই আপত্তি তোলা যায়। গল্প - উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে একদমবাদ দিয়ে শুধু তার গড়ন আর আকার - প্রকার নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে। কথাসা হিত্যকে শুধু এই দিক দিয়ে দেখাটা দাশনিক বিচারে আমার আগাগোড়াই ভাববাদী বলে মনে হয়।

কিন্তু তার জন্যে কথাসাহিত্যের আঙ্গিক দিকটি বাতিল হয়ে যায় না। তোদোরোভ, প্রপ, প্রিন্স্ প্রমুখ তত্ত্বকাররা চূড়ান্ত একপেশেভাবে ন্যারেটিভ - এর বিচার - বিশ্লেষণ করেছেন -- এ কথা ঠিক।১ অন্যদিকে, কথাসাহিত্যের মার্কসীয় বিচারে আঙ্গিককে অনেকটাই অবহেলা করা হয়-- এও তো মিথ্যে নয়।২ ন্যারেটলজির একটি বস্তুবাদী বিকল্প গড়ে তোলা দরকার। সে-কাঠামোয় কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক দু-ই গুত্ব পাবে। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে চলতি ন্যারেটলজির একটি দুর্বলতা তুলে ধরতেচাই।৩ সেটি হলো ন্যারেটর ও ন্যারেটীর সম্পর্ক।৪

।।দুই ।।

খেলার মতো দু পক্ষ ছাড়া গল্প হয় না। গল্পটি কেউ বলে বা লেখে, অন্য কেউ সেটা পড়ে বা শোনে। ন্যারেটলজি-র আলোচনায় প্রথমেই আসে এই দু পক্ষর কথা ন্যারেটর, অর্থাৎ যিনি গল্পটি বলেছেন/ লিখছেন, আর ন্যারেটী, যিনি শুনেছেন/ পড়ছেন। এই ন্যারেটর দু ধরণের হতে পারেন। তার মধ্যে একটি হলো ভরসা যোগ্য, আর তার উলটো দিকে ভরসা অযোগ্য।৫ গুলগল্প, ভূতের গল্প,শিকারের গল্প, হামবড়ামির গল্প -- এ গুলোর কথক ন্যারেটর-এর রকমফের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।৬ সে -তুলনায় ন্যারেটীবেশ উপেক্ষিত। অন্তত ন্যারেটী নিয়ে তেমন কোনো বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখনও চোখে পড়ে নি। অথচ সকলেই বোঝেন, ন্যারেটর - এর মতো ন্যারেটী -ও অনেক ধরণের হয়। যে - গল্পেরন্যারেটর -কে আমি ভরসার অযোগ্য বলে ধরে নিচ্ছি, অন্য কার কাছে সে খুবই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। ন্য ারেটী-র ক্ষেত্রেও তাই সরলবিশ্বাসী - অবিশ্বাসীর কথা উঠবে।

কতক লেখক সচেতনভাবে অলৌকিক গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চান। যেমন, জন্মান্তর নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্য ায়ের ‘‘রক্তসন্ধ্যা’’। এই শরদিন্দুই আবার ভূত নিয়ে কিছু হাসির গল্প লিখেছেন। যেমন, ‘‘শূন্য নয়’’। ভূতে বিশ্বাস না - করলেও গল্পটি পড়ে মজা পেতে বাধা নেই। কোলরিজ একেই বলেছিলেন উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ, অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় না দেওয়া বা সাময়িকভাবে মুলতবি রাখা।৭

ন্যারেটলজি-র আলোচনায় ন্যারেটী-কে ধরে রাখা হয় গল্প-র বাইরে।৮ একের - ভেতরে - দুই গল্পে৮ ঠিক তার উল্টোটাই ঘটে। এ ধরণের গল্পে দু-জোড়া ন্যারেটর ও ন্যারেটী থাকে। প্রথম জোড়া হলো কাঠামো গল্পর লেখক ও প াঠক, আর দ্বিতীয় জোড়া ভেতরের কাহিনীর কথক ও শ্রোতা।৯ পরশুরাম লিখছেন ‘‘দক্ষিণরায়’’, পড়ছি আমরা। ত ার মধ্যে আবার চাটুজ্যেমশায় বলছেন বকুবাবুর বাঘ হয়ে যাওয়ার গল্প, শুনছেন বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার স্থায়ী সভ্যরা। আবার কাঠামো গল্পর ভেতরের গল্পটিও পড়ছি আমরাই। অর্থাৎ আমরা, পাঠকরা দুটি গল্প পড়ছি।

পরশুরামের ক্ষেত্রে দেখবার এই যে, তাঁর একের ভেতরে - দুই গল্পের শ্রোতার সংখ্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহু। সব

একের - ভেতরে দুই- গল্পেই একজন মাত্র কথক থাকেন, কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা সর্বদা এক হয় না। গোড়ার দিকে পরশুরামের একের - ভিতরে - দুই গল্পে শ্রোতা থাকত চার বা পাঁচ বা আরও বেশি। পরে এক বক্তা/ এক শ্রোতার কয়েকটি গল্পও তিনি লিখেছেন, যেমন "অত্রুর সংবাদ", "নিরামিষাশী বাঘ" ও "শিবলাল"। তুলনায় দুর্বল গল্প, "নীলকণ্ঠ" -- ও এই দলে পড়ে। অন্যদিকে একাধিক শ্রোতাকে দেখা যায় তাঁর যাবতীয় আড্ডা - কেন্দ্রিক গল্পে। চাটুজ্যেমশায়, সিদ্ধিনাথ, জটাধর বকশী আর যতীশ মিত্র বা ভূপতি মুখোজ্যে তাঁর গল্প পরিবেশন করেন এমন এক একটি আড্ডায়।

"যদু ডাক্তারের পেশেন্ট"-এ দেখি ক্যালকাটা ফিজিওসারজিক ক্লাবের সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠক বসেছে। এটি অন্য রকমের আড্ডা যদু ডাক্তারের গল্প শোনেন কয়েকজন ডাক্তার ও সার্জেন। "ভরতের ঝুমঝুমি" --তেও শ্রোতা তিনজন (টহলরামকে ধরলে, চারজন)। অর্থাৎ এসব গল্পর ক্ষেত্রে শুধু ন্যারেটী বললে হবে না, তাকে বহুবচনের রূপ দিতে হবে। আর সেই ন্যারেটীরাও সবাই এক ধাঁচের নয় কেউ সরলবিশ্বাসী, কেউ সংশয়ী। আগেই বলা হয়েছে, ন্যারেটী-রও আবার রকমফের থাকে কেউ চালাক (যেমন বিনোদ উকিল), কেউ উদো (যেমন বংশলোচনবাবুর শালা উদয়)।
ন্যারেটলজি-র আলোচনায় ন্যারেটী-র বৈচিত্র্য আসে না কেন? তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, পশ্চিমে ন্যারেটলজির দিকপালরা একচক্ষু হরিণের মতো 'এক গল্প এক কাহিনী'-র কথাই ভাবেন, একের - ভেতরে - দুই গল্পগুলোর সব বিশেষত্ব খেয়াল করেন না। অথচ পরশুরামের মতো লেখকরা গল্পের গড়ন নিয়ে নানা পরীক্ষা চালান। তাঁর ন্যারেটী - রাও সবাই এক ধরনের লোক নন; প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর বৈশিষ্ট্য থাকে।

এখানে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একটি দিক বেছে নিচ্ছি। সেটি হলো গল্পর সত্যি - মিথ্যের ব্যাপারে ন্যারেটী-র বিশ্বাস না অবিশ্বাস। অবশ্যই বিশ্বাস - অবিশ্বাসের প্রশ্নটা উঠবে অতিরঞ্জিত বা অলৌকিক গল্পর ক্ষেত্রে। দক্ষিণরায়ের গল্প শুনতে শুনতে বারে বারে নগেনের ঠোঁট নড়তে থাকে। রোমাঞ্চিত হয়ে সে বলে ফেলে 'দক্ষিণরায়', অর্থাৎ এইবার গল্পে দক্ষিণরায়ের আবির্ভাব হবে। চাটুজ্যেমশায়ের ধমক খেয়েও গোটা গল্পর সঙ্গে নিজের একাত্মতা সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। উল্টো দিকে "কামরূপিণী" -র ভেতরের গল্পটি আদৌ অলৌকিক ছিল না, অন্তত "দক্ষিণরায়" -এর ভেতরের গল্পর মতো ততটা আজগুবি নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? শীতুমামার গল্পটিকে ইলা, উর্মিলা আর সুচি আগাপাশতলা বিশ্বাস করে ফেলেন,১০ বিশেষ করে যখন তাঁর জানতে পারেন নবাগতা দুই মহিলার একজনের নাম মায়াবতী মর্দরাজ, আর তাঁর জামাই হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে গেছেন। অর্থাৎ "কামরূপিণী" -র ভেতরের গল্পর সব শ্রোতাই কামরূপ -কামাখ্যার মেয়েদের সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারে ঘোর বিশ্বাসী। শীতল চৌধুরীর বলা গল্পটি বিশ্বাস করতে তাঁদের বাধে না।

এর ঠিক উল্টো দিকে আছে "একগুঁয়ে বার্থা"-র শ্রোতারা। ট্রেনের কামরায় বসে বার্থা নামে এক মোটরগাড়ির প্রভুভক্তির কাহিনী শুনে তাঁরা সবাই সেটিকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু মজাও পান। একজন পরামর্শ দেন "খাসা গল্পটি মাখনবাবু কিন্তু বড্ড তড়বড় করে বলেছেন। যদি বেশ ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচশ পাতার একটি উপন্যাস লিখতে পারেন তবে আপনার রবীন্দ্র - পুস্কার মারে কে। যাই হোক বেশ আনন্দে সময়টা কাটল।"

এ তো গেল একদিকে সরলবিশ্বাসী অন্যদিকে ঘোর অবিশ্বাসী ন্যারেটী-র কথা। বংশলোচনবাবুর আড্ডায় বিশেষত্ব এই যে, এখানে দুরকম শ্রোতাই থাকেন। লৌকিক - অলৌকিকের মধ্যে নগেন, উদো আর বংশলোচনবাবু কোনো তফাত করেন না। মহেশের মহাযাত্রার গল্প শুনে বংশলোচনবাবু যথেষ্ট গম্ভীরভাবেই জানতে চান "গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?" নগেনের কথা তো আগেই বলেছি। এ আড্ডায় একমাত্র অবিশ্বাসী হলেন বিনোদ উকিল। দক্ষিণরায়ের গল্প শুনে চাটুজ্যেমশায়ের কাছে তিনি জানতে চান বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খেয়েছেন কিনা। একই গল্পে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী শ্রোতার সহাবস্থান নজর করার মতো।

আরও একটি ব্যাপার দেখার আছে। ''কামরূপিণী''-তে শুধু বিশ্বাসী শ্রোতাদের কথা বলেই পরশুরাম ক্ষান্ত হন নি। শীতল চৌধুরীরবানানো গল্প শুনে সে শ্রোতারা যে নিজেরাই ঠকেছেন, ভালো ভালো খাবার না খেয়ে উপোসী থেকেছেন--সে নিয়েও গল্পর শেষে মজা করা হয় ''বাড়ি ফিরে সে সব কথা শুনে বীরেন বলল, ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি করলে তোমরা! এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী। শীতুমামার গাঁজাখুরী গল্পটা বিশ্বাস করলে। তিনি নিজে তো গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছেন।''

মনে রাখতে হবে গল্পটি শু হয়েছিল রূপকথায় রাক্ষসীর কথা দিয়ে। বাচচা নুটুকে রাক্ষুসীর গল্প বলছিলেন শীতুমামা। তাতে আপত্তি করেছিলেন নুটুর মা। কারণ ''এতে ছোট ছেলেদের মনে একটা খারাপ ছাপ পড়ে।'' এর থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল রূপকথার গল্পগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কিনা। তার খেই ধরেই শীতুমামা বলভদ্র মর্দরাজের গল্পটি বলেন। আর সেই গল্প দিয়ে নুটুর মা ও তার সঙ্গে অন্যদের ওপরেও এক মোক্ষম প্রতিশোধ নেওয়া গেল তাঁদের আর খাওয়াই হলো না। বোঝা যায় একমাত্র শীতুমামাই জানতেন সুকোমল গুপ্তর শাশুড়ির নাম মায়াবতী মর্দরাজ। সেই সুযোগেই তিনি বলভদ্র মর্দরাজ আর মায়াবতী কুঞ্জির গল্পটি ফাঁদতে পারেন।

।। তিন ।।

ন্যারেটী নিয়ে এত কথা বলছি এই জন্যে যে, ন্যারেটীর ধরণ দিয়েই লেখকের উদ্দেশ্য ভালোভাবে প্রকাশ পায়। যদি কেউ মনে করেন, গল্প মানেই গল্প, লেখকের উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই তাহলে আমি নাচার। ঠিক উল্টো কথাটাই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়।লেখক নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লেখেন। সেটা স্রেফ মজা দেওয়াও হতে পারে। এমনকি লিখে মজা পাওয়াও হতে পারে। মজাদেওয়া ও পাওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য। পরশুরাম কিন্তু শুধুই মজা দেওয়ার জন্যে লিখতেন না। অনেক সময়েই দেখা যাবে ভেতরের গল্পটি চূড়ান্ত আজগুবি, কিন্তু তিনি জানেন এমন পাঠকও আছেন যাঁরা সে - গল্পও বিনা দ্বিধায় সত্যি বলে ধরে নেবেন। এই পাঠকরা যে সবাই নেহাৎই নাবালক তা নন। বহু প্রাপ্তবয়স্ক লোকও ছাপার হরফকে বা বড়দের কথাকে বেদবাক্য জ্ঞান করেন। তা একের ভেতরে দুই গল্পর ভেতরের গল্পটি যতই গাঁজাখুরি হোক, সেটা বিশ্বাস করতে তাঁদের কোনো অসুবিধে হয় না।
পরশুরাম এ কথা বুঝতেন। অথচ ভেতরের গল্পটি তাঁর কাছে এতই মজাদার ঠেকত যে সেটা লেখার লোভ সামলাতে পারতেন না।আবার যুক্তিবাদী হিসেবে একটা দায়িত্ববোধও তাঁর ছিল। ভেতরের গল্পটি যে পুরোপুরিই বানানো, বাস্তবে অমন হয় না, হতে পারে না - এই কথাটিও তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইতেন। তার জন্যেই কাঠামো গল্পর মধ্যে অন্তত একজন অবিশ্বাসী ন্যারেটী থাকে। তাঁকে রাখতে হয়েছে বিশ্বাসী ন্যারেটীদের ঠাট্টা করার জন্যে।

কখনও কখনও কোনো গল্পে তেমন অবিশ্বাসী শ্রোতা থাকে না। যেমন, ''জটাধর বকশী'' গল্পমালার এমন কেউ নেই (যদিও কপিলগুপ্তকে খানিক সংশয়ী বলে মনে হয়)। এই গল্পমালায় দ্বিতীয় গল্পে (''জটাধরের বিপদ'') -এ দেখা যায় জটাধর যে ভূত দেখানোর নাম করে সবাইকে বোকা বানিয়েছিলেন-- সে - কথা সব শ্রোতাই পরে বুঝেছেন।

এই হলো একই চরিত্রদের নিয়ে গল্পমালা গাঁথার সুবিধে। যেভাবেই হোক, পরশুরাম সমস্ত মোহ ভাঙার চেষ্টা করেন; অলৌকিক বলে যে কিছু হয় না - সেটি ধরিয়ে দেন। একের ভেতর - দুই গল্পে মজাটুকুই শেষ কথা নয় - সেটা বোঝানোই পরশুরামের উদ্দেশ্য।

।। চার ।।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ন্যারেটী-র গুত্ব ন্যারেটর -এর চেয়ে এতটুকু কম নয়। আর ন্যারেটী-র প্রতিত্রিয়া গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব বাস্তব - অবাস্তব বোধ থেকে। একই ন্যারেটরকে দিয়ে (যেমন, চাটুজ্যেমশায়) পরশুরাম সম্ভব ও অসম্ভব দু-

ধরণের গল্পই বলিয়েছিলেন।১২ ''স্বয়ম্বরা'' -র ভেতরের গল্পটি মজাদার কিন্তু অসম্ভব নয়। আবার ''মহেশের মহাযাত্রা'' অনেকটাই ধাঁধার মতো মরে ভূত হয়ে মহেশবাবু তাঁর জীবৎকালে ভূতে - অবিশ্বাস ছাড়তে রাজি নন। ভূতের অনস্তিত্ব নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে - ছাত্র শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে তার জন্যে তিনি একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু ''ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই।''মহেশফান্ড-এর টাকা সুদে - আসলে বেড়েই চলেছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব উঠেছিল ''টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হ'ক।কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শু হ'ল যে সববাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফান্ডের নাম কেউ করে না।'' তাহলে মড়ার খাটের ওপর দাঁড়িয়ে ''লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে'' মহেশ যে বলেছিলেন ''আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি'', তার কী হবে? এর সমাধানের ভার পরশুরাম পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

আবার এ-ও দেখবার গল্পর গোড়াতেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেতরের গল্পর কথককে পরশুরাম ভরসার অযোগ্য করে হাজির করেন। যেমন, যদু ডাক্তার। তাঁর যে ভীমরথীর দশা -- আগেই তা বলে রাখা হয়। তাঁর গল্প শুর আগেই অন্য ডাক্তার ও সার্জেনরা জানেন এইবার একটা আজগুবি গল্প শোনা যাবে। যদু ডাক্তারের মুখের ওপর কিছু না বললেও তাঁর স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যেই সেই গল্প শোনেন। অন্যদিকে ''একগুঁয়ে বার্থা''-র শ্রোতারা যে সকলেই অবিশ্বাসী - সে কথা প্রথমে বলা হয় নি। মাখনবাবুর গল্প শেষহলে তাঁরা নিজমূর্তি ধরেন।

প্রত্যেকটি অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক গল্পে ন্যারেটী - দের প্রতিত্রিয়া বোঝা যায় সেই বিশেষ গল্পর খেই ধরে। এ ধরণের গল্পে পরশুরাম যে অবিশ্বাসী ন্যারেটী - দের প্রশ্রয় দেন, সরল বিশ্বাসী ন্যারেটী-দের খোরাক করেন- এতে তাই আশ্চর্যের কিছু নেই।

শুধু পরশুরামই নন, আরও অনেকের গল্পেই ন্যারেটী-র ধরণধারণ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।১৩ তার থেকেই দেখা যাবে ন্যারেটী-র ভূমিকা নেহাত কম নয়। উল্টো দিকে, অলৌকিক বা অতিলৌকিক গল্পকে যাঁরা পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চান, তাঁদের গল্পে ন্যারেটী-র ভূমিকা নগণ্য বা একেবারেই শূন্য, কারণ তিনি সরলবিশ্বাসী ধরণের, প্র বা আপত্তি তোলার কোনো মতলবই তাঁর থাকে না। অন্যভাবে বললে, ন্যারেটী-র মারফতই লেখকের উদ্দেশ্য ঠিকমতো ধরা পড়ে।/

।।টীকা ।।

ন্যারেটলজি বিষয়ে জানতে হলে এ. ভি. অশোক -এর বইটি দিয়ে শু করা যেতে পারে (এতে অবশ্য ন্যারেটী -কে কোনো গুত্বই দেওয়া হয় নি)। তারপর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে নানা রিডার (যেমন, ডেভিড লজ) ও শব্দকোষ (বালডিক, ফাউলার, হর্থন) দেখতে পারেন। স্রেফ ন্যারেটলজি-র একটি অভিধান খাড়া করেছেন জেরালড্ প্রিন্স্ (১৯৮৯)। এছাড়া পোর্টার, টুলান ও কোবলি-র বইগুলি দেখা যেতে পারে। তবে পাঠককে গোড়াতেই সাবধান করে দিই এই শাস্ত্রটির ক্ষেত্রে এখনও খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি; অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষার তাৎপর্য সম্পর্কেই তত্ত্বকাররা একমত নন। তণ মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন মানুষের সারসত্তা প্রকাশ পায় গান শোনার মতো কান, রূপের সৌন্দর্য দেখার মতো চোখ ইত্যাদি দিয়ে ((১৯৬১) ১০৮)। এঙ্গোলসও একবার অন্যান্য প্রসঙ্গে আত্মসমালোচনা করে লিখেছিলেন ''এ সেই পুরনো গল্প বিষয়বস্তুর জন্যে প্রথমে সর্বদাই রূপ (ফর্ম)- কে অবহেলা করা হয়।'' মেহরিং - কে লেখা চিঠি, ১৪.৭.১৮৯৩।নির্বাচিত পত্রগুচ্ছ। ন্যারেটলজির অন্য কিছু দুর্বলতা নিয়ে আগে কিছু আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, (২০০৫), ২৭-৩৪ দ্র.। এসব পরিভাষার বাঙলা প্রতিশব্দ নিয়ে এখুনি মাথা ঘামাব না। একই পরিভাষা দিয়ে এক-এক তত্ত্বকার এক-এক ব্যাপার বোঝেন। সুতরাং অভিধান ঘেঁটে মাছিমারা প্রতিশব্দ তৈরি করা বেকার। কাবুর বিচারে পাঠকই একমাত্র ন্যারেটী (কোবলি, ২৩৬)। কেউ আবার ন্যারেটী এক 'বিশুদ্ধ টেকনুটুয়াল কন্সট্রাকট্' প্রিন্স্ (১৯৮৯), ৫৭)। এদের পারিভাষিক নাম 'রিলায়েব্ল্ ন্যারেটর' অর 'আনরিলায়েব্ল্ ন্যারেটর'। তবে কখনোই

পরিষ্কার করে বলা হয় না কার চোখ দিয়ে এই যোগ্যতা - অযোগ্যতা বিচার কারা হচ্ছে। এখনও অবধি এই ক'রকম ন্যারেটর - এর নাম পেয়েছি ডাইজেটিক, এক্সট্রাডাইজেটিক, ইনট্রডাইজেটিক, হোমোডাইজেটিক, হেটেরোড াইজেটিক (প্রিন্স্ (১৯৮৯) দ্র.)। এছাড়া দৃষ্টিকোণ ও ন্যারেশন - এর দিক থেকেও নানা উপভাগ চালু আছে। কে ালরিজ, অধ্যায় ১৪, ১৬৯। শুধু গল্প নয়, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এমন আঙ্গিকের ব্যবহার দেখা যায়। ন্য ারেটলজিস্টরা সর্বদাই একটু গালভারী নাম পছন্দ করেন। কাঠামো - গল্প বা বাইরের গল্পটিকে তাঁরা বলেন ফ্রেম ন্য ারেটিভ বা মেট্রিক্স্ ন্যারেটিভ, আর ভেতরের গল্পটিকে এমবেডেড ন্যারেটিভ বা নেস্টেড ন্যারেটিভ। ফরাসিতে এই কৌশলটির নাম মিস অ্যাঁ আবীম, Misen sbyme। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মিকে বাল নামে ন্যারেটলজির এক গু ভেতরের গল্পটির নাম দিয়েছেন হাইপোন্যারেটিভ। ইন্টারনেট ঘাঁটা সুযোগ থ াকলে <http://en.wikipedia.org/wiki/story_a_story. অ ার<www.cx.unibe.ch/ens/og.genres/pppn.htm/-এই দুটি ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। মহাভারত -এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন জোড়া কথক ও শ্রোতার দেখা পাওয়া যায়। বিশেষ করে শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব-য় ভীষ্ম অ ার যুধিষ্ঠিরের প্র - উত্তরের সময়ে নানা দার্শনিক প্রসঙ্গে এই কৌশলটি ব্যবহার কারা হয়েছে। মহাভারত - এর প্রামা ণিক সংস্করণের টীকায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সংবাদ উইদিন অ সংবাদ' (অনুশাসনপর্ব, ভূমিকা, ৭৫টী. ১)। মনে র াখবেন তখনও ন্যারেটলজি বলে কোনো শাস্ত্র জন্ম হয় নি। তবু ভীষ্ম - যুধিষ্ঠির সংবাদ-এর মধ্যে ভৃগু - ভরদ্বাজ সংব াদকে সনাক্ত করতে কারই অসুবিধে হয়নি। অধ্যাপক নিকুঞ্জ চৌধুরী অবশ্যই শীতুমামার গল্পটি বিশ্বাস করেন নি, যদিও অন্যদের সঙ্গে তিনিও সেই গল্পই শুনেছিলেন। এ ব্যাপারে সেরা উদাহরণ টেনিদার শাশুড়ি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্য ায়ের ছোটদের গল্পে যে টেনিদার কথা আছে, সেই টেনিদা নন; ২০, পাটলডাঙা ষ্ট্রিটের যেবাড়িতে নারায়ণ গঙ্গোপ াধ্যায় এককালে ভাড়া থাকতেন সেই বাড়িওয়ালার ছেলেরডাকনাম ছিল টেনি। কিন্তু নাম ছাড়া আসল টেনির সঙ্গে গল্পর টেনির কোনো মিলই ছিল না। তার ফলে এই আসল টেনি বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে বহুবার বিপদে পড়তে হয়েছে। 'শ্বশুরবাড়ি গেছেন, শাশুড়ি (তথৈব) সামনে এনে রাখলেন এক কাঁসি ঘুগনি। প্রভাতবাবু কিছুতেই খাবেন না। যত বলেন এসব তাঁর পছন্দের নয়,শাশুড়ির অনুরোধ ততো বাড়তে থাকে- একটু অন্ততঃ মুখে দাও প্রভাতবাবু স্ত্রী পর্যন্ত মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে প্রভাতবাবু এসব পছন্দ করেন না।শাশুড়ির গম্ভীর উত্তর আসে, ছাপার অক্ষরে যখন বেরিয়েছে মিথ্যে হতে পারে।" তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ১২৫। চাটুজ্যেদের রকে বসে টেনিদা অন্যের পয়সায় পাঁঠার ঘুগনি খাচ্ছেন -- একথা এতবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এসেছে যে তা ভোলা অসম্ভব। এমবেডেড ন্যারেটিভ সম্পর্কে জেনেত বলেছিলেন এ হলো ফিকটিভিটি-র নিশ্চিত লক্ষণ, কারণ ঐতিহাসিকরা এই কৌশল এড়িয়ে যান। তবে এর উল্টোটাও যে সত্যি হবে, অর্থাৎ এমবেডেড ন্যারেটিভ না থাকাটাই ননফিক্টিভিটি বা প্যাকচুয়ালিটি-র লক্ষণ- এমনও ধরা যায় (পোর্টার, ১৮৯)। জেনেত-এর সিদ্ধান্ত যে পুরোপুরি ঠিক নয় তা "স্বয়ম্বরা" বা "দ্বান্দ্বিক কবিতা" পড়লে বোঝা যায়। দু-এরই ভেতরের গল্পে অতিরজন আছে, কিন্তু ফ্যাকচুয়ালিটির উপাদান সর্বদাই হা জির। চাটুজ্যেমশায় তো দাবি করতেন "গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা" ("স্বয়ম্বরা")। তাঁকে তা তিয়ে দেওয়ার জন্যে বিনোদ উকিল বলেন "বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।" অবশ্য "দক্ষিণরায়" বা "মহেশের মহাযাত্রা' - কে সত্যি বলতে সকলে রাজি হবেন না। অন্যদিকে চাটুজ্যেমশায় ভূত ভগবান, লৌকিক অলৌকিকসবই মানেন। ফলে ন্যারেটর হিসেবে তিনি নিজেকে সর্বদাই ভরসার যোগ্য বলে মনে করেন। "মণিহার" অ ার "ক্ষুধিত পাষাণ" -এর সূত্রে আগেও এ নিয়ে আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৭ দ্র.।